‘বাংলাভাষা-পরিচয়ে’ বিশ্লেষিত বাংলা ভাষার রূপ

তারিক মনজুর*

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গদ্যের লিখিত রূপকে মুখের ভাষার কাছাকাছি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সাধু গদ্যের জায়গায় একসময় কথ্য ‘চলতি ভাষা’ জায়গা করে নেবে। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে চলতি বাংলার ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটি সরাসরি কোনো ব্যাকরণগ্রন্থ নয়; তবে যেভাবে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে বাংলা ভাষার রূপ ও প্রবণতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। বাংলা লিখিত গদ্যের কাঠামো প্রচলিত ব্যাকরণ-নির্ভর হবে, না কি বাংলা গদ্যের চাল অনুযায়ী ব্যাকরণের কাঠামো নির্মিত হবে, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল সুস্পষ্ট। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা ভাষার রূপ সম্পর্কে গ্রন্থলেখকের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথকে যেমন আবিষ্কার করা সম্ভব, তেমনি বাংলা ভাষার প্রয়োগ-সূত্রও উপলব্ধি করা যাবে।

মৃত্যুর অনধিক তিন বছর আগে, ১৯৩৮ সালে (কার্তিক ১৩৪৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *বাংলাভাষা-পরিচয়* প্রথম প্রকাশিত হয়। মংপুতে থাকাকালে লোকশিক্ষা-সংসদের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইটি লেখা শুরু করেন। তবে শেষপর্যন্ত বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।[১] গ্রন্থের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৩: ৬২৩) লিখেছেন, ‘আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অনুরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশোন্মুখ বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি।’ রবীন্দ্রনাথ এর জবাবে জানিয়েছিলেন, বইটি ভাষার তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয়, রূপের পরিচয় নিয়ে। যদিও স্বীকার করে নিয়েছেন, এ গ্রন্থে তিনি ‘ব্যাকরণের বন্ধুর পথ’ একেবারে এড়াতে পারেননি। লিখিত গদ্যের আদর্শ তুলে ধরতে গিয়ে লেখক চলতি বাংলার প্রবণতা বিশ্লেষণ করেছেন উদাহরণ দিয়ে দিয়ে।

গ্রন্থের ভূমিকায়[২] রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, ভাষার ‘আশ্চর্য রহস্য’ রয়েছে। তিনি বলেন, ‘ভাষা জিনিসটা আমরা অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করি, কিন্তু তার নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখা একটুও সহজ নয়’ (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৫৬৮)। সতত পরিবর্তনশীল যে ভাষা, তার ব্যাকরণেরও পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক বলে তিনি মনে করেন। তাই বলেন, যে নিয়মের ঐক্য ধরে ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়, ভাষার ইতিহাসে তার একটা অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে, আবার এসব সূত্র বা নিয়মেরও বদল ঘটে চলে পদে পদে।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

https://doi.org/10.62328/sp.v57i3.2

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চলিত বাংলা'র রূপ দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ 'চলতি বাংলা' বলতে কলকাতা-কেন্দ্রিক কথ্য ভাষারীতি বুঝিয়েছেন, উনিশ শতকের শেষ নাগাদ যে রীতি পূর্ণতা পেয়ে যায়। তিনি বলেন, 'চলতি বাংলা চলতি বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়।' তাই বলে তিনি ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহারে সমর্থন জানাননি। তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত 'প্রাকৃত বাংলা'র[৩] 'বিক্ষিপ্ত পথগুলো'কে একটি পথে মিলিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করতে বলেছেন। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থটি এ কাজের প্রথম প্রচেষ্টা বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

নাতিদীর্ঘ ভূমিকা ও সংক্ষিপ্ত উপসংহার ছাড়াও *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে রয়েছে তেইশটি পরিচ্ছেদ। এগুলোর কোনো শিরোনাম দেওয়া নেই; তবে বিষয় অনুযায়ী পরিচ্ছেদগুলো এ রকম: ১. ভাষার গুরুত্ব, ২. ভাষার উৎপত্তি, ৩. বস্তু ও ভাবের নামকরণ, ৪. জ্ঞানের ভাষা ও ভাবের ভাষা, ৫. কল্পনাকে ভাষায় রূপ দেওয়া, ৬. ভাষার রূপবদল, ৭. মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা, ৮. রাষ্ট্রভাষা, ৯. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা, ১০. সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক, ১১. সাহিত্যের ভাষা, ১২. বাংলা ভাষার ধ্বনিসূত্র, ১৩. প্রত্যয়, ১৪. সর্বনাম, পুরুষ, বচন ও কাল, ১৫. নির্দেশক, ১৬. বিভক্তি ও কারক, ১৭. অনুসর্গ, ১৮. ক্রিয়া ও ক্রিয়াবিশেষণ, ১৯. অনুজ্ঞা, ২০. অব্যয়, ২১. শব্দদ্বিত্ব, ২২. চলতি বাংলার পদবিন্যাস এবং ২৩. ভাষার প্রবণতা।

এ প্রবন্ধে *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে বিশ্লেষিত বাংলা ভাষার রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার গঠন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার ও বিশ্লেষণের ধারণা পাওয়া যাবে। বিষয় অনুযায়ী আলোচনাকে কয়েকটি ভাগ করা হয়েছে: ভাষাচিন্তা, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, এবং সাধু-চলিত'র দ্বন্দ্ব। উপান্তে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা এবং বাংলা ভাষাকে ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই

মানব-সমাজে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২/১৩: ৫৭১-৫৭২) লিখেছেন, 'যেহেতু মানুষ সম্মিলিত জীব এইজন্যে শিশুকাল থেকে মানুষের সবচেয়ে প্রধান শিক্ষা — পরস্পর মেলবার পথে চলবার সাধনা।... সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা।' সুকুমার সেনও (২০০১: ১৫) প্রায় অনুরূপভাবে ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন, 'মানুষমাত্রেই কোন না কোন সংসার-সীমানার অথবা সমাজগণ্ডির অন্তর্গত। স্বাভাবিক অবস্থায় কোন ব্যক্তি সংসার অথবা সমাজ বিরহিত নয়। যে সংসার বা সমাজের মধ্যে মানুষ বাস

করে সে সংসার ও সমাজভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাহার চিন্তা উদ্দেশ্য এবং কর্মগত সমতা কিছু না কিছু থাকিবেই। ভাষা এই সমতার প্রধান বাহন।'

তবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৫), মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (২০০৮), সুকুমার সেন (২০০১) তাঁদের ভাষার পরিচয় ও সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে উপভাষাকেও আলোচনায় এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ গ্রন্থে ভাষা আলোচনায় উপভাষাকে রেখেছেন ভূমিকার অংশ করে: 'হয়তো উচ্চারণে এবং বাক্যব্যবহারে একজনের সঙ্গে আর-একজনের সকল বিষয়ে মিল এখনো পাকা হতে পারেনি। কিন্তু যে ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলোমেলো ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে' (২০১২/১৩: ৫৬৯)। বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্য থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি রূপ লিখিত ভাষার জন্য গড়ে উঠবে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন।

ভাষার উৎপত্তি নিয়ে *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে কিছু আলোচনা আছে। বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক কতটুকু, এ নিয়ে গত একশ বছরে তর্ক অনেক দূর এগিয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৯৯: ২৭) জোর দিয়ে বলেন, বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে আসেনি: 'জননী হইতে যেমন কন্যা জন্মগ্রহণ করে, সেইরূপ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা জন্মিয়াছে এইরূপ মত কেহই পোষণ করিতে পারেন না, কারণ ভাষাপ্রবাহের মধ্যে আমরা বাঙ্গালার পূর্বে অপভ্রংশ, তাহার পূর্বে প্রাকৃত যুগ দেখি। সংস্কৃত প্রাকৃত যুগের সমসাময়িক একটি সাহিত্যিক ভাষা।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মনে করতেন, সংস্কৃত নয়, বরং প্রাকৃতের সঙ্গেই বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, ধ্বনি-শব্দ-বাক্য-অর্থের সঙ্গে বাংলা ভাষার ব্যবধান অনেক। বাংলা ভাষা প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ আত্মস্থ করেছে; তাই বলে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা নয়। এটি একটি পৃথক ভাষা এবং এর ব্যাকরণও হবে পৃথক। যদিও শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী (১৯৮৪), শ্রীনাথ সেন (১৯৮৪) মনে করেন, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।

ভাষার উৎপত্তির মীমাংসার পরে প্রশ্ন আসে ব্যাকরণের কাঠামো কেমন হবে। হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪: পঁচিশ) বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ যখনই প্রথাগত ব্যাকরণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন তখনই তাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নামান্তর-রূপান্তর বলে নির্দেশ করেছেন; এবং আবেদন জানিয়েছেন প্রাকৃত বাঙলা ব্যাকরণ রচনার।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও (১৩০৮) 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রবন্ধে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের ত্রুটি তুলে ধরেছেন। হুমায়ুন আজাদ অবশ্য মনে করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নতুন ব্যাকরণ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমন্বয় ও ভারসাম্যকে বিবেচনায় রাখতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যাঁরা ভাষা নিয়ে কথা বলবেন কিংবা ব্যাকরণ রচনা করবেন, তাঁরা যেন ভাষার বদলের ব্যাপারটি মাথায় রাখেন। তিনি লিখেছেন: 'মানুষ বানিয়েছে আপনার গায়ের কাপড়। বয়স বাড়তে বাড়তে তার দেহের মাপের বদল হয়। বার বার পুরোনো কাপড় ফেলে দিয়ে নতুন কাপড় না বানালে তার চলে না' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৫৬৮)।

লিখিত বাংলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষপাত চলতি ভাষায়; আর *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে তিনি চলতি ভাষারই ব্যাকরণ রচনা করেছেন। তিনি বাংলা কথ্যভাষার বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়ে এর লিখিত রূপের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের আশা করছেন। আর ভাষার রূপবদলের সাথে সাথে এর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও ব্যাকরণের বদলের সুপারিশ করেছেন।

তিন

প্রথাগত ব্যাকরণে বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা করা হয় মূলত সংস্কৃত রীতিতে। ব্যাকরণগ্রন্থের বাইরে ধ্বনি নিয়ে যেসব আলোচনা হয়েছে, তা মূলত সাংগঠনিক পদ্ধতিতে এগিয়েছে। হ্যালহেড (২০১৮) অবশ্য তাঁর ব্যাকরণে বাংলা বর্ণমালা ও এর উচ্চারণ নির্দেশ করেছেন ইউরোপীয় ব্যাকরণের আদর্শে। যেমন, 'চ' বর্ণের উচ্চারণ নির্দেশ করেছেন এভাবে: 'চ cho, the soft ch in charge: as চামরু chaamroo a proper name' (Halhed, 2018: 10)। পরবর্তী সময়ের ব্যাকরণে ধ্বনিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণরীতি অনুসারে। এসব বিবরণ দেখে মনে হয়, সংস্কৃত ধ্বনি ও বাংলা ধ্বনির কোনো পার্থক্য নেই। হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪: সাতাশ) মনে করেন, এসব ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবৃতি 'বাঙলা ধ্বনিশৃঙ্খলা উদঘাটন করার বদলে সৃষ্টি করে বাঙলা ধ্বনি সম্পর্কে বিভ্রান্তি।'

বাংলা ধ্বনির গুণ বর্ণনার সূত্রপাত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *শব্দতত্ত্ব* (১৯৩৯) বইয়ের অন্তর্গত 'বাংলা উচ্চারণ', 'স্বরবর্ণ অ', 'স্বরবর্ণ এ' ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি বাংলা ধ্বনিসূত্র অনুসন্ধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন অন্যান্য ব্যাকরণবিদ সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪: আটাশ) লিখেছেন: 'তাঁর সময়ের অন্য যাঁরা ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাঁরা সাধারণত পরিচালিত হয়েছেন সংস্কৃত ধ্বনিবর্ণনার দ্বারা, যদিও কেউ কেউ কোনো কোনো অংশে ব্যক্তিগত মত প্রকাশেরও চেষ্টা করেছেন।'

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২/১৩: ৫৯৪) কাত্‌লা, ভেট্‌কি, পুঁচ্‌কে, হাল্‌কা ইত্যাদি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, হসন্তবর্ণের প্রভাবে চলতি বাংলায় যুক্তবর্ণের ধ্বনির প্রাধান্য ঘটেছে। এর কারণও নির্দেশ করেছেন তিনি:

> আরো গোড়ায় গেলে দেখতে পাই, এটা ঘটতে পেরেছে অকারের প্রতি ভাষার উপেক্ষাবশত।
>
> সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণ মিলিয়ে দেখলে প্রথমেই কানে ঠেকে অ স্বরবর্ণ নিয়ে। সংস্কৃত আ স্বরের হ্রস্বরূপ সংস্কৃত অ। বাংলায় এই হ্রস্ব আ অর্থাৎ অ আমাদের উচ্চারণে আ নাম নিয়েই আছে; যেমন: চালা কাঁচা রাজা। এ-সব আ এক মাত্রার চেয়ে প্রশস্ত নয়। সংস্কৃত আ'কারযুক্ত শব্দ আমরা হ্রস্বমাত্রাতেই উচ্চারণ করি, যেমন 'কামনা'। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৫৯৪)

বাংলা ধ্বনিপদ্ধতি সংস্কৃত ধ্বনিপদ্ধতির চেয়ে আলাদা, এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী বাংলা ধ্বনি-বর্ণনা করেছেন। বাংলা ধ্বনি 'অ্যা' এবং সংস্কৃত ধ্বনি 'য' প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> বাংলায় একটা অতিরিক্ত স্বরবর্ণ আছে যা সংস্কৃত ভাষায় নেই। বর্ণমালায় সে ঢুকেছে একারের নামের ছাড়পত্র নিয়ে, তারজন্যে স্বতন্ত্র আসন পাতা হয় নি। ইংরেজি bad শব্দের a তার সমজাতীয়। বাংলায় তার বিশেষ বানান করবার সময় আমরা য ফলায় আকার দিয়ে থাকি। বাংলায় আমরা যেটাকে বলি অন্তঃস্থ য, চ বর্গের জ'এর সঙ্গে তার উচ্চারণের ভেদ নেই। য'এর নীচে ফোঁটা দিয়ে আমরা আর-একটা অক্ষর বানিয়েছি তাকে বলি ইয়। সেটাই সংস্কৃত অন্তঃস্থ য। সংস্কৃত উচ্চারণ-মতে 'যম' শব্দ 'য়ম'। কিন্তু ওটাতে 'জম' উচ্চারণের অজুহাতে য়'এর ফোঁটা দিয়েছি সরিয়ে; 'নিয়ম' শব্দের বেলায় য়'এর ফোঁটা রক্ষে করেছি, তার উচ্চারণেও সংস্কৃত বজায় আছে। কিন্তু যফলা-আকারে (্যা) য়'কে দিয়েছি খেদিয়ে আর আ'টাকে দিয়েছি বাঁকা করে। সংস্কৃতে 'ন্যাস' শব্দের উচ্চারণ 'নিয়াস', বাংলায় হল nas। তার পর থেকে দরকার পড়লে য ফলার চিহ্নটাকে ব্যবহার করি আকারটাকে বাঁকিয়ে দেবার জন্যে। Paris শব্দকে বাংলায় লিখি 'প্যারিস', সংস্কৃত বানানের নিয়ম অনুসারে এর উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল 'পিয়ারিস'। একদা 'ন্যায়' শব্দটাকে বাংলায় 'নেয়ায়' লেখা হয়েছে দেখেছি।
>
> অথচ 'ন্যায়' শব্দকে বানানের ছলনায় আমরা তৎসম শব্দ বলে চালাই। 'যম'কেও আমরা ভয়ে ভয়ে বলে থাকি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, অথচ রসনায় ওটা হয়ে দাঁড়ায় তদ্ভব বাংলা।
>
> সংস্কৃত শব্দের একার বাংলায় অনেক স্থলেই স্বভাব পরিবর্তন করেছে, যেমন 'খেলা', যেমন 'এক'। জেলাভেদে এই একারের উচ্চারণ একেবারে বিপরীত হয়। তেল মেঘ পেট লেজ — শব্দে তার প্রমাণ আছে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৫৯৮-৫৯৯)

বাংলা বর্ণ ও ধ্বনির পারস্পরিকতা অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি মূর্ধন্য-ণ ও দন্ত্য-ন প্রসঙ্গে লিখেছেন, বানানে ওদের ভেদ, ব্যবহারে ওরা অভিন্ন। তিনি আরো বলেছেন, মূর্ধন্য ণ-এর আসল উচ্চারণ বাঙালির জানা নেই। তালব্য-শ, মূর্ধন্য-ষ, দন্ত্য-স নিয়ে লিখেছেন:

> বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃতের তিনটে বর্ণ আছে, শ স ষ। কিন্তু সবকটির অস্তিত্বের পরিচয় উচ্চারণে পাই নে। ওরা বাঙালি শিশুদের বর্ণপরিচয়ে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়েছে। উচ্চারণ ধরে দেখলে আছে এক তালব্য শ। আর বাকি দুটো আসন দখল করেছে সংস্কৃত অভিধানের দোহাই পেড়ে। দন্ত্য স'এর উচ্চারণ অভিধান অনুসারে বাংলায় নেই বটে, কিন্তু ভাষায় তার দুটো-একটা ফাঁক জুটে গেছে। যুক্তবর্ণের যোগে রসনায় সে প্রবেশ করে, যেমন: স্নান হস্ত কাস্তে মাস্তুল। শ্রী মিশ্র অশ্রু: তালব্য শ'এর মুখোশ পরেছে কিন্তু আওয়াজ দিচ্ছে দন্ত্য স'এর। সংস্কৃতে যেখানে র ফলার সংস্রবে এসেছে তালব্য শ, বাংলায় সেখানে এল দন্ত্য স। এ ছাড়া 'নাচতে, 'মুছতে' প্রভৃতি শব্দে চ-ছ'এর সঙ্গে ত'এর ঘেঁষ লেগে দন্ত্য স' এর ধ্বনি জাগে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬০১)

বাংলা বর্ণমালায় দুটি ব-এর প্রয়োজন নেই বলে রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৩: ৬০১) মনে করেন: 'সংস্কৃতে অন্তস্থ, বর্গীয়, দুটো ব আছে। বাংলায় যাকে আমরা বলে থাকি তৎসম শব্দ, তাতেও একমাত্র বর্গীয় ব'এর ব্যবহার।' ক্ষ প্রসঙ্গে লিখেছেন: 'বাংলা বর্ণমালার সবপ্রান্তে একটি যুক্তবর্ণকে স্থান দেওয়া হয়েছে, বর্ণনা করবার সময় তাকে বলা হয়: ক'এ মূর্ধন্য ষ 'ক্ষিয়ো'। কিন্তু তাতে না থাকে ক, না থাকে মূর্ধন্য ষ। শব্দের আরম্ভে সে হয় খ; অন্তে মধ্যে দুটো খ'এ জোড়া ধ্বনি, যেমন 'বক্ষ'।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬০১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলতি রীতির শব্দে হসন্তের প্রভাব প্রসঙ্গে বলেছেন, সাধু রীতির শব্দে প্রচুর পরিমাণে 'অ' উচ্চারিত হয়, যা চলতি উচ্চারণে লোপ পায়। যেমন, 'বিষবৃক্ষ' শব্দটি সাধুভাষায় 'বিশোব্রিক্খো' রূপে উচ্চারিত হয়, কিন্তু চলতি উচ্চারণে তা 'বিশ্ব্রিক্খো' হয়। আবার যুক্তব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে চলতি রীতিতে একটি ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, কিন্তু সাধু রীতিতে সংস্কৃতের উচ্চারণ প্রায় বজায় থাকে। যেমন, 'আবৃত' শব্দটি সাধু রীতিতে 'আবৃতো' হয়, চলতিতে হয় আব্‌ব্রিতো। সাধু রীতি যেহেতু কথ্য রীতি নয়, তাই এর ধ্বনিবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয়। সাধু রীতির ধ্বনি বানান-নিষ্ঠ, অন্যদিকে চলিত রীতির ধ্বনি বানান-নিষ্ঠ নয়।

বাংলা ধ্বনির বৈশিষ্ট্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্পষ্টত, তাঁর এ বর্ণনায় সংস্কৃত ধ্বনিপদ্ধতির প্রভাব রয়েছে। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণগুলোতে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে ধ্বনি-বর্ণনার কারণে রবীন্দ্রনাথকে এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে। তিনি চেয়েছেন, বাংলা ব্যাকরণ যাঁরা রচনা করবেন, তাঁরা যাতে বাংলা ধ্বনির সহজাত বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রেখে ধ্বনিগুণ বিচার করেন।

চার

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে শব্দতত্ত্বের যে আলোচনা পাওয়া যায়, তাও মূলত সংস্কৃত অনুসারী। বাংলা শব্দগঠনের ক্ষেত্রে সমাস, উপসর্গ, প্রত্যয়, লিঙ্গান্তর, পদপরিবর্তন, দ্বিরুক্ত শব্দ ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। ব্যাকরণে বিভিন্ন সমাসের নাম, শ্রেণি ও সমাসকরণের প্রক্রিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে অবিকলভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। হুমায়ূন আজাদ (১৯৮৪: উনত্রিশ) মনে করেন, 'সমাস একটি রূপান্তরশীল প্রক্রিয়া, যা প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতারা অনুধাবন করতে সমর্থ হন নি কখনো।' তিনি উপসর্গ আর প্রত্যয়-যোগে শব্দগঠনের ক্ষেত্রেও 'বিশৃঙ্খলা' দেখতে পান। নব্যব্যাকরণবিদদের মধ্যে এক্ষেত্রে সবার আগে নাম চলে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, যিনি বাংলা শব্দগঠন-শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। *শব্দতত্ত্ব* নামের বইটি বাংলা শব্দের রূপ বিশ্লেষণে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস বলতে হয়।

তবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী নতুনভাবে বাংলা শব্দ বর্ণনার যে প্রয়াস নিয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ের ব্যাকরণে তাকে গ্রহণ করা হয়নি।

খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে যেসব প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২/১৩: ৬০১) উপসর্গ ও প্রত্যয়কে শব্দগঠনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন: 'উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে। তারা আছে একই শব্দের নানা অর্থ বানাবার কাজে। নতুন শব্দ তৈরির করবার বেলায় তাদের নইলে চলে না।' প্রত্যয় সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য 'সংস্কৃতে প্রত্যয় নিয়ম মেনে চলে, বাংলায় প্রায়ই ফাঁকি দেয়' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬০২)। বাংলার নিজের নিয়মে সংস্কৃত স্ত্রীবাচক প্রত্যয়গুলোও ব্যবহৃত হয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তিনি লিখেছেন:

> আকারযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ সংস্কৃত থেকে বাংলা ধার নিয়েছে, যেমন 'লতা'; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় বাংলায় নেই; সংস্কৃতে আছে জানি, এত বেশি জানি যে, আকারান্ত শব্দ দেখবামাত্র তাকে নারীশ্রেণীয় বলে সন্দেহ করি। বাংলাদেশের মেয়েদের 'সবিতা' নাম দেখে প্রায়ই আশঙ্কা হয় 'পিতা'কে পাছে কেউ এই নিয়মে মাতা বলে গণ্য করে।... এ দিকে 'নীলিমা' 'তনিমা' প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ আকারের টানে মেয়েদের নামের সঙ্গে এক মালায় গাঁথা পড়ে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬০৪)

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলা বিশেষ্যপদে বহুবচনের প্রভাব অল্প; অধিকাংশ জায়গায় 'সব', 'গুলো', 'সকল' ইত্যাদি শব্দ যুক্ত করে কাজ চালানো হয়। আবার একই বাক্যে 'সব' ও 'গুলো' উভয় প্রয়োগকেই বাংলা ভাষার প্রবণতা বলে মনে করেছেন তিনি: "সব' প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে 'গুলো প্রয়োগটা যোগ দিতে চায়, যেমন: সব চৌকিগুলোই ভাঙা, সব ভিখিরিগুলোই চেঁচাচ্ছে। এখানে 'সব' বোঝাচ্ছে একান্ততা, আর 'গুলো' বোঝাচ্ছে বহুবচন" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬০৫)।

প্রথাগত ব্যাকরণ শব্দের শুদ্ধ-অশুদ্ধ রূপ নির্দেশে বিশেষভাবে কাজ করে। আর এ শুদ্ধাশুদ্ধির প্রধান মাপকাঠি হয় সংস্কৃত ব্যাকরণ। হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪: ১৮১) যথার্থই বলেছেন:

> বাঙলা ভাষায় পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণে সংস্কৃতজ শব্দ, যেগুলো জন্ম নিয়েছে সংস্কৃত সূত্র উপেক্ষা করে; কিন্তু বাঙলা ভাষায় গৃহীত হয়ে গেছে।... এগুলোর জন্য দরকার হয় নতুন সূত্র। সংস্কৃত ব্যাকরণ অমান্য ক'রে যে-সমস্ত শব্দ বাঙলায় জন্মেছে এবং প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেছে, সেগুলা বাঙলা শব্দ, সংস্কৃত শব্দ নয়। সেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে বাঙলা ব্যাকরণের সূত্রের সাহায্যেই। (হুমায়ুন, ১৯৮৪: ১৮১)

নির্দেশক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৩: ৬০৫) লিখেছেন, 'বাংলায় নির্দেশকশব্দরূপে প্রধানত ব্যবহৃত হয়: টি টা খানি খানা। ইংরেজিতে এর প্রতিরূপ the। ইংরেজিতে the বসে শব্দের পূর্বে, বাংলায় নির্দেশক শব্দ বসে শব্দের পরে, বস্তুবাচক বা জীববাচক শব্দের অনুষঙ্গে। যা বস্তু বা জীব-বাচক নয় স্থানবিশেষে তার সঙ্গেও যোগ হয়, যেমন: বেশি লজ্জাটা ভালো নয়, ওর হাসিটা বড়ো মিষ্টি। এখানে লজ্জা ও হাসিকে বস্তুর মতোই কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে'। তবে তিনি কয়েকটি নির্দেশক চিহ্নিত করেছেন, যেগুলো শব্দের আগে বসে; যেমন: সেই, এই, ঐ।

বাংলা ক্রিয়াপদের স্পষ্ট ও সরল সংজ্ঞায়ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৩: ৬১৪): 'হওয়া থাকা আর করা, এই তিন অবস্থাকে প্রকাশ করে ক্রিয়াপদে।' বাংলা বাক্যে সাধারণভাবে 'হওয়া' ক্রিয়াপদ যোগ করতে হয় না। আমি ধনী, তুমি পণ্ডিত — এসব বাক্যে ইংরেজিতে 'হওয়া' ক্রিয়াপদ যোগ করতে হয়, বাংলায় সেটা উহ্য থাকে। তবে আকস্মিক অবস্থা বোঝাতে 'হওয়া' যোগ করতে হয়: 'বর্ষায় পুকুর ঘোলা হয়েছে।' বাংলা ক্রিয়াপদের বিশেষত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন: দুটি ক্রিয়া জোড়া দিয়ে নতুন ক্রিয়াপদ তৈরি করা হয় — যদিও তাদের মধ্যে অর্থের সংগতি থাকে না। যেমন: হয়ে যাওয়া, হয়ে পড়া, হতে থাকা, হয়ে ওঠা; করে যাওয়া, করে ফেলা, করে তোলা, করে দেওয়া, করে চলা, করে ওঠা, করতে থাকা ইত্যাদি। আর-একরকম বিশেষত্ব উল্লেখ করেছেন: বিশেষ্যের সঙ্গে ক্রিয়ার কিংবা দুই ক্রিয়ার অসংগত যোগ। যেমন: মার খাওয়া, গাল দেওয়া ইত্যাদি। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬১৬)

রবীন্দ্রনাথের আলোচনা দেখে মনে হয়, তিনি ক্রিয়াবিশেষণকে আলাদা পদের মর্যাদা দিতে চান। প্রথাগত ব্যাকরণে পদকে সংস্কৃত ব্যাকরণের (ঈশ্বরচন্দ্র: ১৩৬৯) অনুকরণে পাঁচ ভাগে আলোচনা করা হয়, যেখানে ক্রিয়াবিশেষণ আলোচনা করা হয় বিশেষণের মধ্যে। রামমোহন রায়ের *গৌড়ীয় ব্যাকরণে* অবশ্য পদকে দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে:

> পদ, বিশেষ্য, বিশেষণ রূপে দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। যে পদের অর্থ অন্য শব্দার্থের অধীন না হয় তাহাকে বিশেষ্য পদ কথা যায়, আর যাহার অর্থ অন্য শব্দার্থের অপেক্ষিত হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহি। যেমন দেবদত্ত যাইতেছেন, বুদ্ধিমান্ দেবদত্ত ইত্যাদি স্থলে দেবদত্ত শব্দের অর্থ অনধীনরূপে প্রতীত হইতেছে, অতএব দেবদত্ত পদ বিশেষ্য আর যাইতেছেন ও বুদ্ধিমান্ শব্দের অর্থ দেবদত্তের অধীন হয় একারণ তাহারা বিশেষণ হয়। (রামমোহন, ১২৪৭: ৫)

রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৩: ৬১৫) দেখিয়েছেন, দুটি ক্রিয়াপদ জুড়ে ক্রিয়াবিশেষণ তৈরি হতে পারে; যেমন: উঠেপড়ে, নেড়েচেড়ে ইত্যাদি। আবার পদকে দ্বিত্ব করেও ক্রিয়াবিশেষণ হতে পারে; যেমন: জ্বর হবে হবে, জ্বর জ্বর করছে।

ক্রিয়াপদে দু-ধরনের অনুজ্ঞার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। একটি উপস্থিত ব্যক্তিকে অনুরোধ বা আদেশ করা, আরেকটি উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারও সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করা, যেমনঃ ও করুক। অনুজ্ঞার আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাংলা ভাষার চলন অনেক বেশি কথ্যভাষার অনুগামী:

> বাংলা ভাষার প্রধান লক্ষণ, তার ভঙ্গীর প্রাবল্য।... ক্রিয়াপদে একটা অনর্থক 'গে' শব্দের যোগে যে ইঙ্গিত প্রকাশ করা হয় সেটা সহজ শব্দের দ্বারা হয় না, যথাঃ হোকগে করুকগে মরুকগে। এতে ঔদাসীন্যে ও ক্ষোভে জড়িয়ে যে ভাবটা ব্যক্ত করে সেটা অন্য ভাষায় সহজে বলা যায় না। কেননা গে শব্দের কোনো অর্থ নেই, ওটা একটা মুদ্রা। 'হোকগে' শব্দের ইংরেজি তর্জমা করতে হলে বলতে হয়ঃ Let it happen, I don't care। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩ঃ ৬১৬)

রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৩ঃ ৬১৭) মনে করেন, চলতি বাংলা ভঙ্গিপ্রধান ভাষা। তার একটা লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় অসংগতভাবে 'না' শব্দের ব্যবহার হয়। বাক্যে 'না' যুক্ত হয়ে আদেশ বা অনুরোধকে অনুনয়ে নরম করে আনা হয়। যেমনঃ হোক না, করোই না ইত্যাদি। 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের রূপ বাংলা ভাষার আরেকটি বিশেষত্ব বলে মনে করেন তিনি। যথাঃ আমি নই, তুমি নও, সে নয়, তিনি নন, আমি নেই, তুমি নেই, সে নেই, তিনি নেই, হই নে, হও না, হন না, হয় নি, হন নি।

বলক হিসেবে যুক্ত 'ও' এবং 'ই' শব্দাংশদুটিকে গ্রন্থলেখক অব্যয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেনঃ "'ও' শব্দটা মিলন জানায়, 'ই' শব্দ জানায় স্বাতন্ত্র্য। 'তুমিও যাবে', অর্থাৎ মিলিত হয়ে যাবে। 'তুমিই যাবে', অর্থাৎ একলা যাবে। 'সে যাবেই ঠিক করেছে', অর্থাৎ তার যাওয়াটাই একান্ত। 'ও' দেয় জুড়ে, 'ই' ছিঁড়ে আনে।" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩ঃ ৬১৯)।

রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৩ঃ ৫৯৩) মনে করেন, সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান প্রভেদ ক্রিয়াপদের চেহারায়। যেমন, সাধু ভাষার 'করিতেছি', 'করিয়াছি', 'করিলাম', 'করিতেছিলাম', 'করিয়াছিলাম', 'করিব' ক্রিয়াপদ চলিত ভাষায় হয়ে যায় 'করছি', 'করেছি', 'করলাম, 'করছিলাম', 'করেছিলাম', 'করব'। ক্রিয়াপদের এ দীর্ঘ-হ্রস্বের পার্থক্য সাধু ও চলিত ভাষাকে আলাদা করেছে। এছাড়া সর্বনাম ও বচনের চিহ্নেও পার্থক্য আছে।

চলতি বাংলার সর্বনাম নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ আলোচনায় প্রধান হয়েছে, বাংলা ভাষার হাজার বছরের ইতিহাসে শব্দের রূপের ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং শব্দের সমকালীন রূপ ও অর্থযোগের বিষয়টি:

> 'মুই' এক কালে উত্তমপুরুষ সর্বনামের সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল, প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে তা দেখতে পাই। 'আমহি' ক্রমশ 'আমি' রূপ ধরে ওকে করলে

> কোণঠেসা, ও রইল গ্রাম্য ভাষার আড়ালে। সেকালের সাহিত্যে ওকে দেখা গেছে দীনতাপ্রকাশের কাজে, যেমনঃ মুঞি অতি অভাগিনী।
>
> নিজের প্রতি অবজ্ঞা স্বাভাবিক নয় তাই ওকে সংকোচে সরে দাঁড়াতে হল। কিন্তু মধ্যমপুরুষের বেলায় যথাস্থানে কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই, তাই 'তুই' শব্দে বাধা ঘটে নি, নীচের বেঞ্চিতে ও রয়ে গেল। 'তুহিঁ' 'তুমি'-রূপে ভর্তি হয়েছে উপরের কোঠায়। এরও গৌরবার্থ অনেকখানি ক্ষয়ে গেল, বোধকরি নির্বিচার সৌজন্যের আতিশয্যে। তাই উপরওয়ালাদের জন্যে আরও একটা শব্দের আমদানি করতে হয়েছে, 'আপহিঁ' থেকে 'আপনি'। আইনমতে মধ্যমপুরুষের আসন ওর নয়, ওর অনুবর্তী ক্রিয়াপদের রূপ দেখলেই তার প্রমাণ হয়। 'তুমি'র বেলায় 'আছ'; 'আপনি'র বেলায় 'আছেন', এই শব্দটি যদি খাঁটি মধ্যমপুরুষ-জাতীয় হত তা হলে ওর অনুচর ক্রিয়াপদ হতে পারত 'আপনি আছ' কিংবা 'আছঁ'। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬০৬)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বনামকে ব্যক্তিবাচক, স্থানবাচক, কালবাচক, পরিমাণবাচক, তুলনাবাচক ও প্রশ্নবাচক ধরে আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে সর্বনামের ভাগ দেখানো হয়েছে (দ্র. ঈশ্বরচন্দ্র (১৩৬৯) এবং মুনীর ও মোফাজ্জল (২০১৩))। বাংলা সর্বনামে লিঙ্গভেদ নেই, এটাও রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় গুরুত্বের সঙ্গে এনেছেন।

লিখিত সাধু রীতি ও কথ্য চলতি রীতির মধ্যে তৎসম-অতৎসম শব্দের পার্থক্য কিংবা সংখ্যাগত পরিমাণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেননি। তিনি শব্দের বানান, উচ্চারণ ও আর্থ-বৈশিষ্ট্য বদলে যাওয়ার কালানুক্রমিক ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই শব্দকে দেখতে চেয়েছেন কালের বিচারে, আর লিখিত বাংলায় শব্দের প্রয়োগ করতে চেয়েছেন চলতি বাংলার প্রবণতা অনুসারে।

পাঁচ

বাংলা ব্যাকরণগুলোতে বাক্যতত্ত্বের আলোচনা থাকে সীমিত পর্যায়ে। অবাক করা ব্যাপার, মনোএল দা আসসুম্পসাঁও তাঁর খণ্ডিত ব্যাকরণে বাংলা বাক্যের সংগঠন নিয়ে মনোযোগী হয়েছেন (আসসুম্পসাঁও, ১৯৮৪: ৩৯৮-৪০১)। তিনি উনিশটি সূত্রে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বাংলা বাক্যের সাধারণ নিয়ম ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কথ্য বাংলাকে আয়ত্ত করার জন্য তিনি এসব সূত্র লিখে রেখে থাকবেন।

হুমায়ুন আজাদ বাংলা বাক্যতত্ত্বের আলোচনাকে সীমিত ও ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেন:

> প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকে দুটি পরিচ্ছেদ অনিবার্যভাবে উপস্থিত থাকে: একটির নাম সাধারণত হয় কারক, অন্যটির নাম 'বাক্যপ্রকরণ'। 'কারক' পরিচ্ছেদে তাঁরা

> সংস্কৃত বাক্যতত্ত্ব অনুসারে বর্ণনা করেন বাঙলা বাক্য, যদিও অনেকেই বুঝতে ব্যর্থ যে কারক নামে তাঁরা বর্ণনা করছেন বাক্য; আর বাক্যপ্রকরণ পরিচ্ছেদে পাশ্চাত্য উদ্দেশ্য-বিধেয়কাঠামোতে বিশ্লেষণ করেন বাক্য। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকের বাক্যবর্ণনা শুধু অগভীর ও সীমাবদ্ধই নয়, তা অনেক ত্রুটিতেও আচ্ছন্ন। তবু বাঙলা বাক্যের গঠন সম্পর্কে জ্ঞানের জন্য আমাদের শরণ নিতে হয় ওই পুস্তকরাশিরই। (হুমায়ুন, ১৯৮৪: ৩৯৫)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে বাংলা বাক্যের আলোচনা করতে গিয়ে এর বিভক্তি, কারক ও পদবিন্যাস নিয়ে বলেছেন। বাক্য তৈরির ক্ষেত্রে এর অনায়াস ভঙ্গির বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন, যা চমস্কির (১৯৫৭) বাক্য-উৎপাদনের অনন্ততার সূত্র মনে করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, বাংলা বিশেষ্য শব্দে সংস্কৃত বিশেষ্য শব্দের অনুস্বার-বিসর্গ না থাকাতে কর্তৃকারকের চিহ্নের কোনো উৎপাত নেই। পরক্ষণে মন্তব্য করেছেন: 'একেবারে নেই বলাও চলে না। কর্তৃপদে মাঝে মাঝে একারের সংকেত দেখা যায়, যেমন: পাগলে কী না বলে' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬১২)।

কর্মকারকের ক্ষেত্রেও দেখিয়েছেন সাধারণভাবে বিভক্তি যুক্ত হয় না; যেমন: রাখাল গোরু চরায়, ময়রা সন্দেশ বানায়। তবে একইসঙ্গে বলেছেন, 'নিয়মের নাগাল যেই পাওয়া যায় অমনি জুটে যায় অনিয়মের দৃষ্টান্ত'। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো'। এক্ষেত্রে অবশ্য যুক্তি দিয়েছেন, কর্মকারকে কে বিভক্তি যুক্ত করার ব্যাপারটি সাধারণ নয়, বিশেষ: 'বউয়ের উপকারের জন্যে শাশুড়ি যদি ঝিকে মারে সে একটা বিশেষ ব্যাপার, মারাটা সাধারণ ঘটনা নয়' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬১৩)। রবীন্দ্রনাথের কাছে করণ কারক হলো 'উপায়' এবং অধিকরণ কারক 'আধার'। যে কারণে, 'হাতে করে খাও' বললে 'হাত' করণ কারক হয়; আর 'হাত দিয়ে নাও' বললে 'হাত' অধিকরণ কারক হয়। তাঁর মতে, বিভক্তি কারক নির্দেশের উপায় নয়।

রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৩: ৬২২) স্বীকার করেছেন, 'যাঁরা সাধু ভাষায় গদ্যসাহিত্যকে রূপ দিয়েছিলেন স্বভাবতই তাঁদের হাতে বাক্যবিন্যাসের একটি ধারা বাঁধা হয়েছিল'। তা নিয়ে অবশ্য তিনি তর্ক তোলেননি, শুধু বলেছেন, 'এ বাঁধাবাঁধি বাংলা চলতি ভাষার নয়':

> কোথায় গেলেন তোমার দাদা, তোমার দাদা কোথায় গেলেন, গেলেন কোথায় তোমার দাদা, দাদা তোমার গেলেন কোথায়, কোথায় গেলেন দাদা তোমার: প্রথম পাঁচটি বাক্যে 'গেলেন' ক্রিয়াপদের উপর এবং শেষের বাক্যটিতে 'কোথায়' শব্দের উপর ঝোঁক দিয়ে এই সবকটা প্রয়োগই চলে। আশ্চর্য তোমার সাহস, কিংবা, রেখে দাও তোমার চালাকি, একেবারে ভাসিয়ে দিলে কেঁদে: সাধু ভাষার ছাঁদের চেয়ে এতে আরও বেশি জোর পৌঁছয়। যা থাকে অদৃষ্টে, যা করেন ভগবান, সে পড়ে আছে

> পিছনে: এ আমরা কেবল-যে বলি তা নয়, এইটেই বলি সহজে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬২২)

কথ্য বাংলার যে অনায়সলব্ধ প্রবণতা আছে, রবীন্দ্রনাথ লিখিত বাংলার জন্য তাকে গ্রহণ করতে বলেছেন। তিনি সাধু গদ্যরীতির বাক্যপদ্ধতি ভেঙে চলতি গদ্যের রূপ তৈরি করে দেখিয়েছেন।[৪]

ভাষার প্রবণতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল স্পষ্ট:

> শব্দপুঞ্জে বিশেষ্যে বিশেষণে সর্বনামে বচনে লিঙ্গে সন্ধিপ্রত্যয়ে এই ভাষা অত্যন্ত বিপুল এবং জটিল। অথচ তার কোনো ভার নেই আমাদের মনে, বিশেষ কোনো চিন্তা নেই। তার নিয়মগুলো কোথাও সংগত কোথাও অসংগত, তা নিয়ে পদে পদে বিচার করে চলতে হয় না। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬২৩)

ভাষা স্বতঃউৎসারিত হয়; বাক্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের সূত্র বা বিধি মাথায় রাখতে হয় না। আবার, ভাষার ব্যাকরণ রচনার সময়ে সেই সূত্র বা বিধি লেখা উচিত যা ভাষিক জনগোষ্ঠী দ্বারা স্বতঃউচ্চারিত হয়।

ছয়

বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থগুলোতে অর্থতত্ত্বের অংশটি সবচেয়ে ক্ষীণ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শব্দতত্ত্বের আলোচনায় অর্থকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। যেমন, দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগে অর্থ-বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে (মুনীর ও মোফাজ্জল, ২০১৩: ৪৯–৫২)। হুমায়ুন আজাদও লক্ষ করেছেন, ভাষার আলোচনায় কীভাবে অর্থতাত্ত্বিক আলোচনা গৌণ হয়ে থেকেছে:

> বাঙলা আর্থতাত্ত্বিক রচনা — প্রথাগত বা আধুনিক — আক্ষরিকার্থেই দুর্লভ। সব ভাষার প্রথাগত ব্যাকরণপ্রণেতারাই ভাষার আর্থস্তরটিকে এড়িয়ে চলেন; সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরাও অর্থকে বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনার বিষয় বলে মনে না ক'রে ভাষাবিজ্ঞান থেকে অর্থশাস্ত্রকে অনেকটা বহিষ্কার করেছিলেন। বাঙলা অর্থতাত্ত্বিক রচনা হিশেবে, অনন্যোপায় হ'য়ে, স্বীকার ক'রে নিতে হয় শুধু অভিধানরাশিকে। (হুমায়ুন, ১৯৮৪: বত্রিশ-তেত্রিশ)

হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪: তেত্রিশ) বলেছেন, কোনো কোনো প্রথাগত ব্যাকরণে সংস্কৃত রীতিতে বাংলা শব্দের অর্থমূলক শ্রেণিকরণ করা হয়। এমন শ্রেণিকরণে বাংলা শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় — যৌগিক, রূঢ় ও যোগরূঢ়। বাংলা ব্যাকরণে এ-অর্থতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব শব্দ উদাহরণ হিসেবে আনা হয়, সেগুলো অবিকল সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে গৃহীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শব্দকে প্রতীকমাত্র বলতে চান:

> ভাষা নিয়ে মানুষের প্রতীকের কারবার। বাঘের খবর আলোচনা করবার উপলক্ষ্যে স্বয়ং বাঘকে হাজির করা সহজও নয়, নিরাপদও নয়। বাঘে মানুষকে খায়, এই

> সংবাদটাকে প্রত্যক্ষ করানোর চেষ্টা নানা কারণেই অসংগত। 'বাঘ' বলে একটা শব্দকে মানুষ বানিয়েছে বাঘ জন্তুর প্রতীক। বাঘের চরিত্রে জানবার বিষয় থাকতে পারে বিস্তর, সে-সমস্তই ব্যবহার করা এবং জমা করা যায় ভাষার প্রতীক দিয়ে। মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে এই তার একটি বিরাট প্রতীকের জগৎ। এই প্রতীকের জালে জল স্থল আকাশ থেকে অসংখ্য সত্য সে আকর্ষণ করছে, এবং সঞ্চারণ করতে পারছে দূর দেশে ও দূর কালে। ভাষা গড়ে তোলা মানুষের পক্ষে সহজ হয়েছে যে প্রতীকরচনার শক্তিতে, প্রকৃতির কাছ থেকে সেই দানটাই মানুষের সকল দানের সেরা। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৫৭৪)

রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৩: ৫৭৪) এও লক্ষ করেছেন, ধ্বনিতে গড়া বিশেষ বিশেষ প্রতীক যে বিশেষ বিশেষ বস্তুর নামধারী হয়ে কাজ চালাচ্ছে তা নয়, আরও সূক্ষ্ম তার কাজ। ভাষাকে তাল রেখে চলতে হয় মনের সঙ্গে। সেই মনের গতি কেবল চোখে দেখার সীমার মধ্যে সংকীর্ণ নয়। যেগুলোকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কেবল ভাবা যায়, সেগুলো প্রকাশ করার জন্য বিশেষণ-জাতীয় শব্দ তৈরি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ (২০১২/১৩: ৫৭৩) মেনে নিয়েছেন, শব্দের একটা মূল অর্থ থাকে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সমস্ত শব্দেরই এক-একটা মূল ধাতু অনুমান করে নেওয়া হয়। তবে গ্রন্থলেখক এটাও জানিয়ে রেখেছেন, যে কোনো শব্দ মূল অর্থকে ছাপিয়ে কালে কালে শব্দ নানা ব্যঞ্জনা, এমনকি নতুন অর্থ লাভ করে।

জ্ঞানের ভাষা ও কাব্যিক ভাষা এক হবে না, সেটা রবীন্দ্রনাথ ভালোই জানতেন। এ দুই ভাষায় শব্দের অর্থের ব্যাপারটি ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা হবে বলে তিনি মনে করেন:

> মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্তপ্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষায় অনেক তফাত। জ্ঞানের ভাষা যত দূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা করে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্তমতো, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাঁকা করে দিয়ে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৫৭৪)

অর্থ নিয়ে *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে যেসব কথা আছে, তা সরাসরি অর্থতত্ত্বের আওতাভুক্ত নয়। ভাষার রূপের আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো জায়গায় অর্থের প্রসঙ্গ টেনেছেন।

সাত

বাংলা ভাষায় একইসঙ্গে সাধু ও চলিত রীতির অবস্থান দেখে ফার্গুসন (১৯৫৯) উল্লেখ করেছেন, খুব সীমিতভাবে বাংলায় দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি রয়েছে। দ্বিবাচন বলতে তিনি একই ভাষার দুই রকম বুলির প্রয়োগকে বুঝিয়েছেন:

> DIGLOSSIA is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation. (Ferguson, 1959: 199)

এখানে দেখা যায়, দ্বিবাচনের একটি স্থায়ী ভাষিক পরিস্থিতি, যার রয়েছে অপেক্ষাকৃত জটিল ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য। এটি উচ্চ বাচনিক পরিস্থিতি রূপে সমাজে স্বীকৃত হয়। উচ্চ বাচনিক রূপ হিসেবে এর লিখিত সাহিত্যিক ঐতিহ্যও রয়েছে। বাংলা ভাষার আরেকটি বাচনিক রূপ, যেটিকে বলা যায় নিম্ন বাচনিক রূপ, প্রাত্যহিক জীবনের কথোপকথনে ও সামাজিক যোগাযোগে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে উচ্চ রীতির নাম 'সাধু ভাষা' ও নিম্ন রীতির নাম 'চলিত ভাষা'। হুমায়ুন আজাদ (১৯৮৪: সাতষট্টি) লিখেছেন, 'দ্বিরীতিক ভাষা-পরিস্থিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উচ্চ ও নিম্নরীতির ভূমিকা নির্দিষ্টায়ন বা বিশেষীকরণ: কিছু সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয় উচ্চরীতিটি, আর অন্যকিছু সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয় নিম্নরীতিটি।'

উনিশ শতকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে এবং পরবর্তী সময়ে গদ্য-লেখকদের হাতে সাধু রীতি সুসংবদ্ধ, সুস্থিত মান রূপ লাভ করে। ওই সময়ে কলকাতা-কেন্দ্রিক জীবনের জন্য দরকার হয়ে পড়ে একটি মান কথ্য ভাষা, যা সর্ববঙ্গীয় হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলতি রীতির উৎসভূমি হিসেবে কলকাতাকে নির্দেশ করেছেন। 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ (২০১২/৬: ৬০৬) বলেছেন, 'বাংলা দেশের নানাস্থানে নানাপ্রকার উচ্চারণের ভঙ্গি আছে। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।'[৫]

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলিত রীতির মান রূপের বৈশিষ্ট্য কী হবে, তা বিধিবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, চলিত রীতির দাপটে সাধু রীতি সংকুচিত হয়ে পড়বে। সাধু রীতিকে 'সুয়োরানী' আর চলিত রীতিকে'দুয়োরানী' আখ্যা দিয়ে তিনি লিখেছেন: 'আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।' (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৩: ৫৮৩)

আট

বাংলা ভাষার রূপ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। তিনি (২০১২/১৩: ৫৬৮) বলেছেন, 'ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাত

এই – তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোলবিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী'। একইসঙ্গে এও বলেছেন, 'চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি বকে যাব' (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৩: ৫৬৮)। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যচর্চার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার রূপ-বৈচিত্র্য লক্ষ করেন এবং ভাষার সূত্র অনুসন্ধানে আগ্রহী হন। এসব কারণে ব্যাকরণ আলোচনার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত সূত্র তিনি অনুসরণ করেননি। যেমন, *বাংলাভাষা-পরিচয়ে* ধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শব্দের রূপ নিয়ে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর আলোচনায় মোটেই প্রাধান্য পায়নি বাংলা ভাষার বাক্যিক গঠন ও অর্থগত পরিবর্তন। অথচ ব্যাকরণ বা ভাষার সূত্র আলোচনার ক্ষেত্রে ধ্বনি ও শব্দের সঙ্গে বাক্য ও অর্থ প্রধান আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে।

হুমায়ুন আজাদ অবশ্য আরেকটু কঠিন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে বলেছেন, 'প্রকৃত বাঙলা ব্যাকরণের কাঠামো ঠিক কি হবে, তা তিনি [রবীন্দ্রনাথ] ব্যাখ্যা করেন নি' (হুমায়ুন, ১৯৮৪: পঁচিশ)। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রচলিত ব্যাকরণকে কাঠামো ও বর্ণনার দিক থেকে সংস্কৃত-অনুসারী বলেছেন।

বাংলায় ব্যবহৃত নির্দেশক শব্দ রবীন্দ্রনাথের মতে 'টা টি খানা খানি' (২০১২/১৩: ৬১১)। অন্যদিকে নিজের গদ্য ভাষায় তিনি অবলীলায় কথ্য উচ্চারণের 'টে' শব্দেরও প্রয়োগ করেছেন; যেমন: তিনটে, চারটে ইত্যাদি।

কর্তৃকারকে বিভক্তির অনুপস্থিতিকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (২০১২/১৩: ৬১২)। আর 'পাগলে কী না বলে' এ জাতীয় বাক্যে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগকে বলেছেন 'তির্যক্‌রূপ'। বাংলাদেশের কোনো কোনো কথ্য রীতিতে কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ আছে, যা তিনি প্রাদেশিক প্রয়োগ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'সব গৌড়ীয় ভাষায় এই তির্যক্‌রূপ পাওয়া যায়'।

আবার সাহিত্যিক বলেই রবীন্দ্রনাথ *বাংলাভাষা-পরিচয়ে* জ্ঞানের ভাষা ও ভাবের ভাষাকে আলাদা করে দেখাতে চেয়েছেন (পরিচ্ছেদ ৪-এ); এমনকি কল্পনাকে ভাষায় রূপান্তর করা নিয়ে আলোচনা করেছেন (পরিচ্ছেদ ৫-এ)। প্রথাগত ব্যাকরণ সাধারণভাবে ভাষার এ বিভাজন মেনে কোনো বিবরণ দেয় না। ভাষা-বিশ্লেষণের যে অংশ অর্থতত্ত্ব ও ছন্দ নিয়ে আলোচনা করে, সেখানে তুলনামূলক ও সাংগঠনিক দু-রকম পদ্ধতিরই সংযোগ ঘটেছে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা ভাষা-দর্শনের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রাকৃত বাংলার রূপ হলো কলকাতার আদর্শ কথ্য ভঙ্গি। যে কারণে শব্দ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে কলকাতাকেই আদর্শ মানছেন

(যেমন: এলেকা, লিখছি নে, পাই নে, দুটো-চারটে, লিখেছিলুম ইত্যাদি)। অথচ বাংলা ভাষার আদর্শ ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে তিনি 'ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের' ভাষিক উপাদানের 'প্রাদেশিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত' সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের কথা বলেছেন (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৪: ২০৮)।

নয়

চলিত রীতিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২/১৩: ৫৬৮) বলেছেন 'প্রাকৃত বাংলা'। প্রাকৃত বাংলা বলেই তিনি এ ভাষার বানান পদ্ধতিতে উচ্চারণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যে কারণে এ-কার লেখার ক্ষেত্রে 'ে' (এ) ও 'ে' (অ্যা) — দুই রকম রূপের প্রস্তাব করেছেন এবং তিনি নিজেও তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। শব্দপ্রয়োগেও সচেতনভাবে তৎসম শব্দের বদলে তদ্ভব ও কথ্য শব্দের প্রয়োগ করেছেন; যেমন: ভিক্ষা না বলে 'ভিক্ষে', এটা না বলে 'এইটে', মিশ্রণের না বলে 'মেশাবার', পর্ব না বলে 'পালা', শব্দগঠন না বলে 'শব্দগড়ন', সবকয়টি না বলে 'সবকটা' ইত্যাদি। আবার বাংলা উচ্চারণে হ্রস্ব ই-এর প্রাধান্য মেনে নিয়ে বানানেও এর প্রয়োগ করতে বলেছেন, '... ব্যাকরণের এই-সকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানেই খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ঈকারকে মানব' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬০৫)। যেসব ই-প্রত্যয় সংস্কৃত নয়, সেগুলোতে তিনি হ্রস্ব-ই ব্যবহার করেছেন; যেমন: সরকারি, ইংরেজি, মুসলমানি, হিন্দি, হিন্দুস্থানি ইত্যাদি।

শুধু শব্দগঠনে নয়, বাক্যের সংগঠনেও চলতি ভাষায় 'স্বাধীনতা' লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি (২০১২/১৩: ৬২২) বলেছেন, সাধু ভাষার বাক্যবিন্যাসে ধরা-বাঁধা নিয়ম আছে, তবে চলতি ভাষায় তা নেই। বাক্যগঠনের এ সুবিধাকে তিনি লেখার ভাষায় ব্যবহার করার কথা বলেছেন এবং নিজেও ব্যবহার করেছেন। যেমন: 'আমরা তাদের বহন করে চলেছি কিছুই চিন্তা না করে' (২০১২/১৩: ৬২৩) — এ বাক্যের চারটি অংশ: আমরা/ তাদের/ বহন করে চলেছি/ কিছুই চিন্তা না করে। অংশগুলোকে আগে-পরে সাজিয়ে যে-কোনোভাবে বাক্যটি নতুন করে লেখা সম্ভব ছিল। তিনি (২০১২/১৩: ৬২২) নিজেও উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন 'কোথায় গেলেন তোমার দাদা, তোমার দাদা কোথায় গেলেন, গেলেন কোথায় তোমার দাদা, দাদা তোমার গেলেন কোথায়, কোথায় গেলেন দাদা তোমার' — সবকয়টি প্রয়োগই চলে।

চলতি বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ভঙ্গিপ্রধান ভাষা'; এ কথার পিছনে যুক্তি হিসেবে বলেছেন, 'তার একটা লক্ষণ ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় অসংগতভাবে 'না' শব্দের ব্যবহার। এর কাজ হচ্ছে আদেশ বা অনুরোধকে অনুনয়ে নরম করে আনা' (২০১২/১৩: ৬১৭)। 'না' শব্দের নানা রূপভেদ আছে, যেমন — নই, নও, নয়,

নন, নেই, নে, না, নি। এগুলোকে তিনি পূর্ণ শব্দ মনে করেন, যে কারণে 'হই নে', 'হয় নি' ইত্যাদি শব্দেও তিনি নে, নি-কে আলাদা করে রাখতে চান।

প্রায় ৮৪ বছর আগে লেখা *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থে লেখক চলিত রীতি ব্যবহার করেছেন, যখন প্রবন্ধ লেখার রীতি হিসেবে সাধু রীতি প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। রবীন্দ্রনাথের (২০১২/১৩: ৫৮৩) মতে, 'সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।' লেখার রীতি হিসেবে 'চলতি'কে গ্রহণ করার কারণে, চলতি বাংলার সহজাত প্রবণতা অনুযায়ী শব্দপ্রয়োগে ও বাক্য-সংগঠনে *বাংলাভাষা-পরিচয়-এ* সাবলীল গদ্যের নমুনা হয়েছে।

দশ

সাধু ও চলিত – দুটি পৃথক ভাষা নয়, একই ভাষার দুটি মানরীতি। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে তাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। সাধু ছিল লিখিত সাহিত্যিক ভাষা, চলিত ছিল আঞ্চলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ মুখের ভাষা। বিশ শতকের সূচনালগ্নে চলিত রীতি একটি মান্য রূপ পায় এবং সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হতে থাকে। বর্তমানে লিখিত ভাষার রাজ্যেও চলিত রীতির একতরফা রাজত্ব। তাছাড়া সাধুরীতির প্রয়োগও দিন দিন কমে আসার কারণে সাধু-চলিতের রীতিগত ফারাকও গেছে কমে।

লিখিত ও কথ্য উভয় ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার মান রূপটি কাছাকাছি হয়ে পড়ায় এখন যেটির দরকার হয়ে পড়েছে বেশি, সেটি হলো বাংলা ভাষার আদর্শ ব্যাকরণ রচনা করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের মাধ্যমে যে কাজটির সূচনা করেছেন, পরবর্তী আট দশকের বেশি সময়ে রচিত ব্যাকরণগ্রন্থগুলোতে তার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। রবীন্দ্র-পূর্বাপর সময়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের কাঠামোতেই বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়ে চলেছে; এখন সময় হয়েছে বাংলা ভাষার ধ্বনি-শব্দ-বাক্য পদ্ধতি ও অর্থবৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলা ভাষার রূপ বিশ্লেষণের।

টীকা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২)। 'বইপরিচিতি', *রবীন্দ্রসমগ্র* খণ্ড ১৩, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা। পৃ. ৭৬০

২. গ্রন্থে ব্যবহৃত ভূমিকাটি গ্রন্থপ্রকাশের আগে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার* ৪৫ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (১৩৪৫) ছাপা হয়।

৩. 'এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃত

প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৫৬৮)

৪. কুঞ্জবাবু চললেন মথুরায়। তাঁর ভাই মুকুন্দ যাবে স্টেশন পর্যন্ত। বৈজু দারোয়ান চলেছে মাঠাকরুনের পাল্কির পাশে পাশে, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, ছিটের মের্জাই গায়ে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ঘর সামলাবার জন্যে রয়ে গেছে ভরুসর্দার। টেমি কুকরটা ঘুমোচ্ছিল সিমেন্টের বস্তার উপর ল্যাজে মাথা গুঁজে, গোলমাল শুনে ছুটে এল এক লাফে। যত ওরা বারণ করে ততই কেঁই-কেঁই ঘেউ-ঘেউ রবে মিনতি জানায়, ঘন ঘন নাড়ে বোঁচা ল্যাজটা। রেল লাইন থেকে শোনা যাচ্ছে মালগাড়ি আসার শব্দ। ডাকগাড়ি আসতে বাকি আছে বিশ মিনিট মাত্র। বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুকুন্দ; সে যাবে কলকাতার দিকে, আজ সেখানে মোহনবাগানের ম্যাচ। ঐ বুঝি দেখা গেল সিগ্ন্যাল-ডাউন। এ দিকে নামল ঝমাঝম্‌বৃষ্টি, তার সঙ্গে জোর হাওয়া। বেহারাগুলো পাল্কি নামালো অশথতলায়। হঠাৎ একটি ভিখিরি মেয়ে ছুটে এসে বললে, 'দরজা খোলো মা, একবার মুখখানি দেখে নিই।' দরজা খুলে চমকে উঠলেন গিন্নিঠাকরুন, 'ওমা, ও কে গো! আমাদের বিনোদিনী যে! কে করলে ওর এ দশা!' কুকুরটা ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, ওর বুকে দুই পা তুলে কাঁই-কাঁই করতে লাগল আনন্দে। বিনোদিনী একবার তার গলা জড়িয়ে ধরল দুই হাতে, তার পরেই ওকে সরিয়ে দিল, জোরে ঠেলা দিয়ে। গোলেমালে কোথায় মেয়েটি পালালো ঝড়ের আড়ালে, দেখা গেল না। চারি দিকে সন্ধানে ছুটল লোকজন। বড়োবাবু স্বয়ং হাঁকতে থাকলেন 'বিনু বিনু', মিলল না কোনো সাড়া। মুকুন্দ রইল তার সেকেন্ড ক্লাসের গাড়িতে, রুমালে মুখ লুকিয়ে একেবারে চুপ। মেলগাড়ি কখন্ গেল বেরিয়ে। বৃষ্টির বিরাম নেই। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৩: ৬২২-৬২৩)

৫. প্রথম চৌধুরী অবশ্য কথ্য ভাষার মান রূপের ক্ষেত্রে কলকাতা বা ঢাকার উপভাষাকে অস্বীকার করেছেন: 'ঢাকাই কথা এবং খাস-কলকাত্তাই কথা অর্থাৎ সুতানুটির গ্রাম্যভাষা, দুয়েরই উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত; সুতরাং ঢাকাই কিংবা খাস-কলকাত্তাই কথা পূর্বেও সাহিত্যে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।' তিনি মান বাংলার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন 'দক্ষিণদেশি' উপভাষাকে। এ 'দক্ষিণদেশ' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন নদিয়া শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান, ভাগীরথীর উভয় কূল এবং বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশকে। (প্রমথ, ১৯৯৮: ২৬৭)

সহায়কপঞ্জি

আসসুম্পসাঁও, মনোএল দা, ১৯৮৪। 'বাক্য-যোজনা', *বাঙলা ভাষা* প্রথম খণ্ড (হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৩৬৯। *ব্যাকরণ-কৌমুদী* (হরলাল রায় সম্পাদিত), চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স, কলকাতা।

প্রমথ চৌধুরী, ১৯৯৮। 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা', *প্রবন্ধসংগ্রহ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ২০১৩। *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ১৯৯৯। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

২০০৮। *বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৮৪। 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত', *বাঙলা ভাষা* প্রথম খণ্ড (হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২০১২। *রবীন্দ্রসমগ্র* খণ্ড ৬ ও ১৩, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

রামমোহন রায়, ১২৪৭। *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*, হিন্দু কালেজ, কলকাতা।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১৯৮৪। 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ', *বাঙলা ভাষা* প্রথম খণ্ড (হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ১৯৮৪। 'নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ', *বাঙলা ভাষা* প্রথম খণ্ড (হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শ্রীনাথ সেন, ১৯০৯। 'প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান', *বাঙলা ভাষা* প্রথম খণ্ড (হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সুকুমার সেন, ২০০১। *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

হুমায়ুন আজাদ, ১৯৮৪। *বাঙলা ভাষা* প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Chatterjee, Suniti Kumar, 1945. *Origin and Development of Bengali Language*, Rupa Prokashoni, Calcutta.

Ferguson, Charles A., 1959. 'Diglossia', *Word*, Harvard University, Cambridge.

Halhed, Nathaniel Brassey, 2018. *A Grammar of the Bengal Language*, Journeyman Books, Dhaka.

Chomsky, Noam, 1957. *Syntactic Structures*, Walter de Gruyter GmbH & Co., Berlin